ভুলে যাওয়া গল্পগুলো

সাহাবিদের ত্যাগ-কুরবানির উপাখ্যান

আলী আহমাদ মাবরুর

গার্ডিয়ান
পাবলিকেশনস

সূচিপত্র

অন্ধকার যুগের সত্যানুসন্ধানী ১১
দেখা না হলেও হওয়া যায় মহামানবের বন্ধু ২৪
সুরাকার ব্রেসলেট ৩৮
ইসলাম অবমাননাকারীর ধ্বংস অনিবার্য ৪১
বন্দির সাথে বিরল মানবিক আচরণ ৪৮
আমির হামজা (রা.)-এর সাহসিকতা ৫৬
মানবঢালে সুরক্ষিত রাসূল (সা.) ৬২
অলৌকিক ঘটনাপ্রবাহের খন্দকের যুদ্ধ ৭২
যে প্রাণে দোল খায় শাহাদাতের তামান্না ৮০
পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধে অগ্রগামী আবু বকর (রা.) ৮৭
সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষায় রাসূল (সা.)-ই অনুসরণীয় ৮৯
পারস্য সাম্রাজ্যে ইসলাম ও রাসূল (সা.)-এর মিরাকল ৯৫
মুয়াজ ইবনে জাবালের প্রতি নবিজির উপদেশ ৯৯
রাসূল (সা.)-এর প্রশিক্ষণ নীতি ১০৭
কাব ইবনে মালেক (রা.)-এর তাওবা ১২২
চার খলিফার ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পর্ক ১৩১
অব্যর্থ দুআ ১৪১

আমওয়াসের প্লেগ..১৪৪
উসমান (রা.)-এর মর্মান্তিক শাহাদাত ১৫৫
প্রদর্শনেচ্ছার পরিণতি ১৬৯
তাওয়াক্কুলের প্রতিদান ১৭২
রবের সান্নিধ্যে রাসূল (সা.) ১৭৬

অন্ধকার যুগের সত্যানুসন্ধানী

সাহাবিরা তারকাতুল্য। আল্লাহর রাসূল (সা.) নিজেই এমনটি বলেছেন। তবে দশজন সাহাবি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। তাঁরা পরিচিতি লাভ করেন 'আশারায়ে মুবাশশারা' হিসেবে। মহান আল্লাহই তাঁদের এই সৌভাগ্য দান করেছেন। একজন ব্যতীত প্রায় জান্নাতিদের সকলের বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তিনি হলেন সাইদ ইবনে জায়েদ (রা.)। তাঁর সম্বন্ধে অনেক কম তথ্য জানা যায়। কারণটা অবশ্য আমার জানা নেই, তবে এটি বিস্ময়কর—সুসংবাদপ্রাপ্তদের নাম এই বীরের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি; তাঁর বর্ণিত হাদিস থেকে।

তাঁকে নিয়ে বেশি কিছু না জানার একটি কারণ থাকতে পারে। তা হলো, নিজেকে আড়ালে রাখতে পছন্দ করতেন তিনি। হয়তো মানুষ হিসেবেও ছিলেন প্রচারবিমুখ। সেই ঐতিহাসিক হাদিস বর্ণনার ক্ষেত্রেও এর প্রমাণ মেলে। হাদিস বর্ণনার সময়ও

তিনি নিজের নামটি বলতে চাননি। এ বিষয়টিই এমনটি ভাবতে উদ্‌বুদ্ধ করে আমাদের। বাকিটা আল্লাহই ভালো জানেন।

‘আশারায়ে মুবাশশারা’-সংক্রান্ত হাদিসটি এ রকম—আবদুর রহমান ইবনুল আকনাস বলেন, একদিন তিনি মসজিদে প্রবেশ করেন। অতঃপর দেখতে পান, এক ব্যক্তি সালাম দিচ্ছেন আলি (রা.)-কে। তখন উঠে দাঁড়ান সাইদ ইবনে জায়েদ (রা.)। এরপর বললেন, একটি বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি। আল্লাহর নবিজিকে বলতে শুনেছি, দশজন লোক জান্নাতে যাবে। আবু বকর জান্নাতি। উমর জান্নাতি। উসমান জান্নাতি। আলি জান্নাতি। তালহা জান্নাতি। এ ছাড়াও জুবাইর ইবনুল আওয়াম জান্নাতি। আবদুর রহমান ইবনে আউফ জান্নাতি। সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাস জান্নাতি। এমনকি আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহও জান্নাতি। অতঃপর সাইদ জানতে চাইলেন, আমি কি দশম ব্যক্তির নাম বলব? লোকেরা বলল, কে সেই ভাগ্যবান? তিনি নীরব থাকলেন। লোকেরা আবার জিজ্ঞাসা করল, কে সেই

সুসংবাদপ্রাপ্ত? এবার তিনি বললেন, দশম ব্যক্তি আমি নিজেই। অর্থাৎ সাইদ ইবনে জায়েদ (রা.)।[১]

এই সাহাবির পিতার নাম জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল। তিনি একজন প্রখ্যাত 'হুনাফাহ'। অন্ধকার যুগে হুনাফাহ বলা হতো কেবল চারজনকে। প্রত্যেকেই তৎকালীন মক্কার বাসিন্দা। এমন সম্মানপ্রাপ্তির যৌক্তিক কারণও ছিল। সমাজের প্রচলিত ও প্রথাগত মূর্তিপূজাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তাঁরা। তার বিপরীতে সমর্থন করেছিলেন একেশ্বরবাদকে। ইবরাহিম (আ.) তাঁদের পূর্বপুরুষ, একই সাথে মুসলিম জাতির পিতা। ফলে তিনিই আদর্শস্থানীয়। তাঁর দেখানো পথটিই প্রকৃত ধর্ম। তাই সেটির অনুসন্ধানে ব্যস্ত সময় পার করতেন হকপন্থিরা।

রাসূল (সা.)-এর নবুয়তের বহু আগের কথা। ঘটনাটি জানা যায় একটি প্রসিদ্ধ সিরাতগ্রন্থ থেকে। ইবনে ইসহাক (রহ.)-ই সেটির রচয়িতা। তাতে উল্লেখ আছে, একবার মক্কার লোকেরা বড়ো একটি

---

[১] সুনানে আবু দাউদ : ৪৬৩২

মেলায় অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণের জন্য তারা শহরও ছেড়ে যায়। অসংখ্য মূর্তির পূজা করা হবে সেখানে। কিন্তু এই চারজন ছিলেন ব্যতিক্রম। সমাজের প্রচলিত স্রোতে কেন যেন গা ভাসাতে পারছিলেন না। তাঁরা এক আল্লাহর অনুসারী। তবে পরস্পর ছিলেন অপরিচিত। পৃথক হয়েই রইলেন নগরবাসীদের থেকে। এর মধ্য দিয়ে তাঁদের মাঝে আত্মিক ও চেতনাগত সম্পর্ক তৈরি হয়। সেই সত্যানুসন্ধানীরা হলেন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল, উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ, উসমান ইবনুল হুয়াইরিস ও জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল।

চিন্তাশীল ও বিবেচকরা নিজেদের বানানো মূর্তির পূজা কখনোই করবে না। এটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, এসব চেতনা অযৌক্তিক; এমনকি কল্পনাপ্রসূত। কুসংস্কারগুলো মোটেও গ্রহণযোগ্য নয়। কিন্তু ওই সময় কেবল চারজনকেই এ দলে পাওয়া যায়। সকল ধর্মীয় অনাচারের বিরুদ্ধে তাঁদের অবস্থান ছিল দৃঢ়। ইতিহাসের পাতায় তা খুব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে। কেননা, তাঁরা ছিলেন মক্কার স্থায়ী নাগরিক।

উৎসবে অনুপস্থিতি ইতিবাচক হয়ে ওঠে। কারণ, সে সূত্রেই একে অপরের মানসিকতা বুঝতে পারেন তাঁরা। মেলায় প্রতিমার সামনেই কুরবানি করছিল কুরাইশরা। সেইসাথে মত্ত হয়ে যায় নাচগানে। পুরো আয়োজনটাই ছিল চোখে পড়ার মতো। তবুও তাতে সম্পৃক্ত হতে চারটি প্রাণ অক্ষম। পরস্পর বলছিলেন, এই বিষয়ে আর লুকোচুরি করার কিছু নেই। স্বগোত্রীয়দের কৃত উপাসনা কখনোই সত্যিকারের দ্বীন নয়। আমাদের আদি পিতা ইবরাহিম (আ.)। কিন্তু তাঁর দ্বীনকে এরা সম্পূর্ণ বিকৃত করে ফেলেছে। পাথরের তৈরি মূর্তির কোনো সক্ষমতা নেই। তারা কিছু শুনতেও পায় না; এমনকি দেখতেও পারে না। এগুলোর সম্মুখে পশু জবাই! এত অর্চনা! কী প্রয়োজন আছে এসবের? প্রস্তরখণ্ডগুলো না আমাদের উপকার করতে পারে, আর না ক্ষতি।

এই অনুধাবনই হয়ে যায় তাঁদের চিন্তার ভিত্তি। তার আলোকেই সিদ্ধান্ত নেন, সত্য দ্বীন খোঁজার। মনস্থির করেন, ভ্রমণ করবেন নিজেদের মতো। আর তা হবে ধারাবাহিক। এটাও ধারণা করেন, বিভিন্ন

অঞ্চলে ছড়িয়ে আছেন ধর্মযাজক ও বিদ্বানগণ। সেই পণ্ডিতদের সাথে কথা বললে ভালো হয়। পরিচিতও হওয়া যাবে। ওইসব বিজ্ঞজনের মাধ্যমেই সত্য ধর্মটি পাওয়া যেতে পারে। আর তা-ই হবে ইবরাহিম (আ.)-এর রেখে যাওয়া আদর্শ।

চারজনের একজন ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। সম্পর্কে খাদিজা (রা.)-এর চাচাতো ভাই। এই ব্যক্তি খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। আর তা খুব অল্প সময়ের মধ্যে। অতঃপর বাইবেল অধ্যয়নে মগ্ন হয়ে পড়েন। ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে জ্ঞানের গভীরতা। পরিচিতিও হন গৃহীত ধর্মের অন্যতম পণ্ডিত হিসেবে। তাওরাত সম্বন্ধেও ভালো জ্ঞান ছিল তাঁর। বিষয়টি জানা যায় সহিহ বুখারি থেকে।

ফেরেশতা জিবরাইল (আ.) হেরা গুহায় আগমন করেন। ওহি নিয়ে এলেন প্রথমবারের মতো। কিন্তু রাসূল (সা.) খুব ঘাবড়ে যান। জ্বরও আসে তাঁর শরীরে। ওই অবস্থায় কোনো রকমে ঘরে ফেরেন। তাঁকে নানাভাবে শান্ত করার চেষ্টা করেন খাদিজা (রা.)। এরপর স্বামীকে নিয়ে যান এই ওয়ারাকার

কাছে। উম্মুল মুমিনিনের সাথে নবিজির বিয়েতে ইতিবাচক ভূমিকাও পালন করেন এই বিজ্ঞ আলিম। নবুয়তপ্রাপ্তির বিষয়টি তিনিই প্রথম বুঝতে পারেন। তা জানিয়ে আশ্বস্তও করেন চাচাতো বোনকে। এটাও বললেন, তাওরাত ও ইনজিলে একজন সত্যনিষ্ঠ নবির কথা বলা হয়েছে। আর মুহাম্মাদই হলেন সেই মহাপুরুষ। তা সত্য হলে তিনিও দ্বীনের পথে মানুষকে আহ্বান করবেন। হয়ে উঠবেন পূর্ববর্তী নবিদের অনুগামী।

এটুকু বলেই থেমে যাননি। একান্তে প্রতিশ্রুতিও খাদিজা (রা.)-কে দেন—প্রেরিত নবির দাওয়াতের সূচনা অবধি বেঁচে থাকলে আমিও সাড়া দেবো। সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাব তাঁর আনুগত্য করার। সমর্থনও করে যাব শেষ পর্যন্ত।

এখানেই শেষ নয়। আরও বেশ কয়েকবার উৎসাহ দিয়েছিলেন তিনি। সাহস জুগিয়েছেন বোন ও তাঁর স্বামীকে। এর দ্বারা একটি বিষয় বোঝা যায়, সত্যানুসন্ধানীর সাথে নবি (সা.)-এর দুই থেকে তিনবার সাক্ষাৎ হয়েছিল। একবার কথা বলেছিলেন

কাবার চত্বরে। দুজনেই তাওয়াফ করছিলেন। তখন আবারও পুনর্ব্যক্ত করেন নিজের সমর্থন। একপর্যায়ে চুমু খান রাসূল (সা.)-এর কপালে।

তবে নবুয়ত পাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকেননি। কয়েক দিন পরেই মৃত্যুবরণ করেন এই সৌভাগ্যবান। পরবর্তী সময়ে তাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন রাসূল (সা.)। বলেন, 'আমি ওয়ারাকাকে জান্নাতে দেখেছি। রেশমের কাপড় পরিহিত অবস্থায়। কারণ, আমার দাওয়াতের ওপর তিনি ঈমান এনেছিলেন।'[২]

চার হুনাফার দ্বিতীয়জন উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহাশ। সম্পর্কে ছিলেন রাসূল (সা.)-এর ফুফাতো ভাই। তখনও ঈসা (আ.)-এর আদর্শে মনস্থির করতে পারছিলেন না তিনি; এমনকি অন্য কোনোটিতেও না। ততদিনে ইসলাম প্রচার শুরু করেছেন নবিজি। তিনিও সাড়া দেন তাতে। গমন করেন আবিসিনিয়ায়; প্রথম হিজরতকারী দলের সাথে। কিন্তু সেখানে গিয়ে ধর্মান্তরিত হন; খ্রিষ্টধর্মে। শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করেন।

---

[২] *জামিউল আহাদিস* : ১৬/১৬১

তাঁদের তৃতীয়জন উসমান ইবনে আল হুয়ারিস। বের হয়ে পড়েন বিভিন্ন দেশ ভ্রমণে। শেষ পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যে পৌঁছান। সাক্ষাতের সুযোগও পান সম্রাটের সাথে। সেই সান্নিধ্যের মাধ্যমেই গ্রহণ করেন খ্রিষ্টধর্ম। তা বিফলে যায়নি। বেশ উঁচু মানের পদ পেয়েছেন। বাদশাহ-ই দিয়েছেন সেটি। শুধু তা-ই নয়; বানাতে চেয়েছিলেন মক্কার রাজাও। তবে কুরাইশরা সে সুযোগ দেয়নি। একপর্যায়ে ভূষিত হন বাইজান্টাইন কার্ডিনাল উপাধিতে। কিন্তু সুখস্মৃতি দীর্ঘ হয়নি। সিরিয়ায় বসবাস করত আরব গোত্র ঘাসান। অঞ্চলটি তখনও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনস্থ। সেখানকার রাজা ছিল আমর ইবনে জাফনাহ। পরবর্তীকালে এই শাসকই তাঁকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে।

চার প্রাণের চতুর্থজন জায়েদ ইবনে আমর। তাঁর অবস্থান ছিল একেবারেই ভিন্ন। খারিজ করে দিয়েছিলেন খ্রিষ্ট ও ইহুদিবাদকে। কারণ, তার বিবেচনায় দুটো ধর্মই বিকৃত হয়ে গেছে। তাই সত্যের সন্ধানে ঘুরে বেড়ান সিরিয়া ও ইরাকের

বিস্তীর্ণ এলাকায়। একনিষ্ঠ ধার্মিক হওয়ার জন্যই এমন ছুটে চলা।

সফরকালেই দেখা হয় একজন খ্রিষ্টান ধর্মযাজকের সাথে। সেই প্রবীণ যাজক জানান, সত্যের বাণী নিয়ে একজন নবি আসবেন। সময়ও হয়ে গেছে তাঁর আগমনের! আরব ভূখণ্ডেই আবির্ভূত হবেন তিনি। পণ্ডিত আরও বলেন, 'তুমি প্রকৃত ধর্ম খুঁজে বেড়াচ্ছ। অথচ এই মুহূর্তে বিশ্বের কোথাও তা নেই। তোমার জন্মভূমিতেই একজন নবি আসার কথা রয়েছে। আর তা খুব শীঘ্রই। এই নবি ইবরাহিমের আদর্শকে আবার প্রতিষ্ঠা করবেন পুরো পৃথিবীতে।'[৩]

এই তথ্যটি পেয়ে জায়েদ মক্কায় ফিরে আসেন। দিন পার করতে থাকেন অনাগত নবির অপেক্ষায়। তবে মূর্তিপূজায় শরিক হননি কখনো; এমনকি পশু কুরবানিতেও না। তার পরিবর্তে শিশুকন্যাদের হেফাজতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। যে পিতারা তাদের কন্যাসন্তানদের জীবন্ত কবর দিতে চাইতেন, তিনি তাদের প্রতিহত করতেন। কন্যাসন্তানদের নিয়ে

[৩] *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ২/৩১২ (সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে প্রকাশিত)।

নিতেন নিজ আয়ত্তে। এ ছাড়াও সবাইকে একটি কথাই বলে বেড়াতেন, কেবল তিনিই ইবরাহিমের সত্য ধর্ম অনুসরণ করে যাচ্ছেন।

জায়েদ প্রায়শই প্রকৃত খোদার কাছে প্রার্থনা করতেন। বলতেন, কীভাবে দুআ ও ইবাদত আপনার কাছে করলে গ্রহণযোগ্য হবে, আমি জানি না। যদি জানতাম, তাহলে অবশ্যই করতাম। কিন্তু আফসোস, আমি তো সেই নিয়ম জানি না। এসব বলে অজান্তেই কপাল বিছিয়ে দিতেন বাহনের পিঠে। সিজদাও করতেন ওভাবে। এভাবেই তিনি আত্মসমর্পণ করতেন আল্লাহর কাছে।[৪]

একটি বর্ণনায় এসবের সত্যতা মেলে। আসমা বিনতে আবু বকর (রা.) এটি বর্ণনা করেছেন। তিনি ছিলেন আয়িশা (রা.)-এর বড়ো বোন। বয়সের ব্যবধান ১২-১৪ বছরের। তিনি বলেন, একদিন তিনি দেখেছিলেন, জায়েদ ইবনে আমর কাবাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ওই অবস্থায় আহ্বান করছিলেন সমবেত কুরাইশ সদস্যদের। বলছিলেন, হে আমার জাতি! তোমাদের পালনকৃত ধর্ম মোটেও

---

[৪] প্রাগুক্ত : ২/৩১২

সঠিক নয়। এই ঘরকে কেন্দ্র করে তোমরা যা করছ, আমাদের পূর্বপুরুষ ইবরাহিমের নামে যা শুরু করেছ, এগুলো অসাড়-অবিবেচনা ছাড়া আর কিছুই না। এ ধরনের উপাসনা ইবরাহিমের ধর্মের ধারে-কাছেও নেই।[৫]

এই সাহসী ছিলেন সত্যপ্রিয়। প্রতিমার সামনে বা তার নামে পশু জবাই অপছন্দ করতেন তিনি। সেসবের গোশতও খেতেন না কখনো।

নবুয়ত পাওয়ার আগের কথা। একদিন রাসূল (সা.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয়েছিল। নবিজি তাঁকে প্রশ্ন করলেন, আপনার গোত্র কুরাইশের সাথে কী সমস্যা চলছে আপনার?

তিনি বললেন, তাদের ধর্মকে সচেতনভাবে ত্যাগ করেছি। ওদের পূজিত মূর্তিকেও প্রভু হিসেবে কোনোভাবেই গ্রহণ করি না। পশুদের সৃষ্টিকর্তাকে প্রভু মানে না তারা। পুজো করে তাঁর সৃষ্ট প্রাণীকে। অথচ রিজিকদাতার উদ্দেশ্যেই কুরবানি করতে হবে। কিন্তু তা করছে নিজেদের বানানো মিথ্যা

---

[৫] *তারিখে দামেশক* : ১৯/৫০৫

উপাস্যের সামনে। অর্চিত খোদাদের খুশি করতেই এই আয়োজন। বিষয়টা একদমই আমি মানতে পারি না। তাই মুশরিকদের উৎসর্গীকৃত পশুর গোশতও খাওয়া তো দূরের কথা, এর ঘ্রাণও নিই না।[৬]

মক্কায় ফিরে এলেও তিনি ততদিনে বয়সের ভারে ক্লান্ত। নবির আগমন পর্যন্ত হয়তো জীবিত থাকবেন না, সেই বিষয়ে শঙ্কিত হয়ে পড়লেন। আমির ইবনে রবিয়া তাঁর দত্তক সন্তান। ডেকে পাঠান তাঁকে। কাছে এলে বলেন, মনোযোগ দিয়ে শোনো বেটা। আমি একটি সংবাদ জানতে পেরেছি। খুব শীঘ্রই মক্কায় একজন নবি আসবেন, সত্য ধর্মের বার্তা নিয়ে। কিন্তু আমি সে পর্যন্ত বেঁচে থাকব কি না জানি না। তবে তোমার জীবদ্দশায় তুমি সেই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ পেতে পারো। যদি তার সাক্ষাৎ পাও, তাহলে আমার সালাম তাঁর কাছে পৌঁছে দেবে। তাঁকে জানাবে, আমি ছিলাম সত্যানুসন্ধানী।

হয়েছেও তা-ই। জায়েদ বেঁচে থাকতে নবিজিকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেননি। তবে তিনি

---

৬ *আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া* : ২/২১৩

মারা গেলেও তাঁর পুত্র আমির ইবনে রবিয়া বেঁচে ছিলেন। আমির ইবনে রবিয়া (রা.) মক্কার প্রথম যুগেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হিজরতের পরও জীবিত ছিলেন ৩৩ বছর। ইন্তেকাল করেন উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে। বাবার দেওয়া দায়িত্বটাও পালন করেছেন এই সন্তান।

এটা খুবই বিস্ময়কর ব্যাপার। না দেখেই নবিজিকে সালাম দিয়ে গেছেন জায়েদ ইবনে আমর! আর তা গ্রহণও করেছেন রাসূল (সা.)। ইসলাম গ্রহণের পর নবিজিকে বিষয়টি জানান আমির ইবনে রবিয়া (রা.)। বলেন, আপনি নবি হবেন কি না, তা আমার পিতা জানতেন না। তবুও সত্যপথের নবি হিসেবে আপনাকে সালাম দিয়ে গেছেন। নবিজি সালাম গ্রহণ করে বলেন, আমি মিরাজের সময় জায়েদকে জান্নাতেই দেখেছি। সুবহানাল্লাহ!

উল্লেখ্য, চার সত্যানুসন্ধানীর মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে স্পষ্টভাষী। প্রকাশ্যেই মূর্তিপূজার সমালোচনা করতেন। পরিত্যাগের আহ্বান জানাতেন ওইসব প্রতিমাকে। ফলে অনেকেই তাঁর

ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল; এমনকি আত্মীয়স্বজনও। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন চাচা আল খাত্তাব।

এই ব্যক্তিই হলেন উমর (রা.)-এর পিতা। বাপ-দাদার পুরোনো ধর্মে ভাতিজাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। সিদ্ধান্তে অটল তিনি। চেষ্টাও ছিল জোরালো। বারবার বৈঠকও করেন ভাতিজার সাথে। সলাপরামর্শও করতে থাকেন। এভাবেই অব্যাহত থাকে উদ্দেশ্য হাসিলের আয়োজন।

কিন্তু এসব যথেষ্ট ছিল না। তাঁর ওপর নজর রাখতে একজন মহিলাকেও নিযুক্ত করেন চাচা। ফলে জায়েদের সমস্ত কার্যক্রমের আপডেট পেয়ে যেতেন তিনি; এমনকি প্রতি মুহূর্তে। মুক্তির সন্ধানে ভ্রাতুষ্পুত্র আবার বের হবেন, এমন পরিকল্পনা করতেই জেনে ফেলতেন ওই নারী। খবরটাও পৌঁছে দিতেন নিয়োগকর্তার কাছে। আল খাত্তাব একটুও দেরি করতেন না। দৌড়ে গিয়ে থামানোর চেষ্টা করতেন এই সত্যপ্রিয়কে। কিন্তু সবই বিফলে যায়। কোনোভাবেই বিরত রাখতে পারেননি তাঁকে; বিশেষ করে মূর্তিপূজার প্রকাশ্য সমালোচনা থেকে। তাই নতুন সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো। নির্বাসনই এর

সমাধান। অবশেষে দুর্দমনীয়কে মক্কার বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তবে নজরদারিটা বন্ধ হয়নি কখনোই। এর জন্য বেশ কয়েকজন যুবককে দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নতুন বাসস্থান ছিল অনেকটাই অসহনীয়। তাই দু-একবার মক্কায় আসতেন তিনি, তবে অত্যন্ত গোপনে। কিন্তু নিযুক্ত প্রহরীরা আল খাত্তাবকে তাও জানিয়ে দিত। প্রতিক্রিয়া হিসেবে স্বভাবসিদ্ধ আচরণটাই প্রদর্শনীয়। তাই আবার চাপ সৃষ্টি করতেন ভাতিজার ওপর। এভাবেই চলতে থাকে কুরাইশ নেতাদের দুর্ব্যবহার ও মানসিক নির্যাতন। আর ক্রমাগত সেই দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে সময় পার করেন তিনি।

ভাতিজাকে নিয়ে শঙ্কিত চাচা। একেবারেই তা অযৌক্তিক ছিল না। কারণ, সত্যানুসন্ধানীর কথা যুক্তিপূর্ণ। তা দিয়েই মোহনীয়ভাবে অনেককে প্রভাবিত করতে পারেন। এর ফলটা নিশ্চিত সুখকর হবে না। বিরাট আকারের বিভক্তি দেখা দেবে মানুষের মাঝে; এমনকি ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে নগরীর সামাজিক কাঠামো।

কত কিছুই-না করা হলো! এরপরও থামানো যায়নি তাঁকে। গোপনে বেরিয়ে পড়েন আবারও সিরিয়ার উদ্দেশে। সম্ভবত গবেষণা, তথ্যানুসন্ধান কিংবা পড়াশোনার কাজে। এ ধারণাটাই সমর্থিত।

এ রকম একটি সফর শেষে সিরিয়া থেকে ফিরছিলেন। মক্কাই ছিল গন্তব্য। কিন্তু জীবনপ্রদীপের জ্বালানিটা ফিরিয়ে নেবেন আল্লাহ। কারণ, চলে যাওয়ার সময়টা এসে গেছে। হয়েছেও তা-ই। জর্ডানের কাছাকাছি এলে অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। আর সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন একটি বর্ণনাও পাওয়া যায়। তাতে উল্লিখিত আছে, নবুয়তের পাঁচ বছর পূর্বে হত্যা করা হয়েছিল এই সত্যপ্রিয়কে।

তাঁর মৃত্যুর সংবাদ মক্কায় পৌঁছায়। খবর পেয়েই দুঃখভারাক্রান্ত হয়ে পড়েন আরেক হুনাফা। তাঁর নাম ওয়ারাকা ইবনে নওফেল। নিহতের ঘনিষ্ঠ বন্ধুও তিনি। সহযাত্রীকে হারিয়ে একটি চমৎকার কবিতাও রচনা করেন এই ধর্মগুরু।

তাবরানি ও মুসনাদে আহমাদে একটি হাদিস আছে। একদিন নবিজির কাছে গেলেন দুই 'আশারায়ে মুবাশশারা'। তাঁরা হলেন, সাইদ ইবনে জায়েদ ও উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)। উল্লেখ্য, এই সাইদ উমর (রা.)-এর বোন ফাতিমার স্বামী। তাঁর ইসলাম গ্রহণের পেছনে বোন ও ভগ্নীপতির ভূমিকা ছিল অপরিসীম।

রাসূল (সা.)-এর সামনে গিয়ে সাইদ (রা.) প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার মানসিকতা ও সর্বশেষ অবস্থান আপনি জানেন। পরকালে তাঁর কী পরিণতি হবে, একটু বলবেন কি? নবিজি বললেন, আমি মিরাজে গিয়ে তোমার বাবাকে জান্নাতেই দেখেছি। সেখানে তাঁকে দুটো দরজা প্রদান করা হয়েছে। আর শেষ বিচারের দিনে তাঁকেও তোলা হবে কবর থেকে; উম্মতে মুহাম্মাদি হিসেবে।

জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল ইতিহাসের একমাত্র ব্যক্তি। এই বিবেচনায়—নবি আসার পূর্বেই তিনি ঈমান এনেছেন। নবুয়তের আগে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। তবুও গণ্য হবেন উম্মতের মধ্যকার একজন

হিসেবে। রাসূল (রা.)-এর এই মন্তব্য থেকে আমরা একটি বিষয় বুঝতে পারি, জায়েদ কেবল সত্যানুসন্ধানীই ছিলেন না; বরং সত্য খুঁজে পাওয়ার প্রত্যাশা বলিষ্ঠভাবে ধারণ করতেও প্রস্তুত রেখেছিলেন নিজেকে। অবশিষ্ট জীবন সেভাবেই পার করেছেন। তাই মহান আল্লাহও এ সম্মানটুকু তাঁকে দিয়েছেন।

কুরাইশদের অন্ধকারাচ্ছন্ন সময় বহমান। তখনও সত্যকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কিছু মানুষ। সফলও হয়েছেন। জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল তাঁদেরই একজন। স্থান করে নিয়েছেন ইতিহাসের পাতায়। কালিমার আওয়াজ শুনতে পাননি। তবুও ধারণ করেছেন তার জ্ঞানকে। প্রত্যাখ্যান করেছেন শিরক ও মূর্তিপূজা; এমনকি নবিজির দাওয়াত না শুনেই।

এ রকমই একজন ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা.)। বসবাস করতেন মদিনায়। জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইহুদি রাব্বি[৭]। রাসূল (সা.) মদিনায় হিজরত করার পরপরই তিনি ইসলাম

---

[৭] ইহুদি ধর্মে ধর্মগুরুকে ‘রাব্বি’ বলা হয়।

গ্রহণ করেন। সেই ঘটনা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন। যেমন, প্রথমবারের মতো রাসূলুল্লাহর আগমনের বিষয়ে জানতে পারি। তখন তাঁর সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বিবরণ জেনে নিই। তাঁর আগমনের সম্ভাব্য সময়ের ব্যাপারেও ধারণা দিতে প্রচেষ্টা চালাই। সক্ষমও হই। এবার অপেক্ষার পালা। আগ্রহ আর অজানা অনুভূতি নিয়ে পার হতে থাকে দিনগুলো। আমার এই বিষয়গুলো কারও সাথে শেয়ার করিনি; এমনকি তিনি মদিনায় আসা অবধিও না। হিজরতের সফরে তিনি প্রথম কুবায় যাত্রাবিরতি করলেন। কয়েক দিন অবস্থান করলেন সেখানেই; আমর ইবনে আউফ-এর গোত্রের সাথে। তখন এক ব্যক্তি আমার কাছে এলেন। জানিয়ে গেলেন তাঁর আগমনের সংবাদটি।

ওই সময়ে খেজুরগাছের ডালে বসা ছিলাম। কিছু কাজ করছিলাম সেখানে। নিচে বসে ছিলেন আমার ফুফু। সম্মানিতার নাম খালিদা বিনতে আল হারিস। রাসূল (সা.)-এর খবরটি জেনেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম। ফুফু তা শুনতে পেয়ে বললেন, তোমার ওপর লানত পড়ুক। এমনভাবে রবের

প্রশংসা করলে যেন নবি মুসা আবার এসেছে! বললাম, ফুফু! আগত ব্যক্তি মুসার ভাই। তিনিও আমাদের নবির মতো। একই ধর্মবিশ্বাস অনুসরণ করেন। তাঁকেও পাঠানো হয়েছে সত্যের বার্তা দিয়ে। ফুফু জানতে চাইলেন, আমরা শেষ জামানায় একজন নবির আগমনের কথা জানি। উনি কি সেই নবি? 'হ্যাঁ' বলেই জবাব দিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তাহলে ঠিক আছে।

গাছ থেকে দ্রুত নেমে পড়লাম। এরপর চলে গেলাম রাসূল (সা.)-এর নিকট। পৌঁছামাত্রই আশ্রয় নিলাম ইসলামের ছায়াতলে। বাসায় ফিরে পরিবারকেও একই কাজের উপদেশ দিই। তাঁরাও সাড়া দিলেন তাতে।

প্রথম দিকে গোপন রেখেছিলাম বিষয়টি। একদিন রাসূল (সা.)-এর কাছে যাই। গিয়ে বলি, হে আল্লাহর রাসূল! ইহুদিরা বরাবরই মিথ্যা আর প্রবঞ্চনাকে অনুসরণ করে। তাই তাদের ভুল ভাঙানোর জন্য আপনার সহযোগিতা চাই। সেইসাথে আমার অবস্থানও জানিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন মনে করছি। আমাকে কোনো একটি ঘরে

লুকিয়ে রাখুন। এটি একটি কৌশল। তারপর ইহুদিদের ডেকে পাঠান। তারা এলে তাদের কাছে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন। ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি না জানলে ভালোই বলবে তারা। কিন্তু তা জানিয়ে দিলে প্রতিক্রিয়া হবে উলটো। দেখবেন, যাচ্ছেতাই গালি দিচ্ছে। আর নানা ধরনের কটু মন্তব্য তো থাকবেই।

প্রস্তাবে সম্মত হলেন রাসূল (সা.)। পরিকল্পনা অনুযায়ী লুকিয়ে রাখা হলো আমাকে। ইহুদিরাও সাড়া দিলো নবিজির ডাকে। যথাসময়ে উপস্থিত হলো তারা। তারা নানা বিষয়ে নবিজির সাথে কথা বলল। কিছু প্রশ্নও করল। একপর্যায়ে এলো আমার প্রসঙ্গ। রাসূল (সা.) তাদের কাছে আমার বিষয়ে জানতে চাইলেন। বললেন, হুসাইন ইবনে সালাম সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কী? তারা বলল, তিনি আমাদের ধর্মীয় নেতা। তাঁর পিতাও ছিলেন একই পদে। এই জ্ঞানী মানুষটি অনেক জানেন। একজন ভালো রাব্বি হিসেবে অনেক সুনাম রয়েছে তাঁর। আমরাও তাঁকে প্রচণ্ড সমীহ করি।

ওদের কথা শেষ হতেই আড়াল থেকে বেরিয়ে আসি আমি। তাদের লক্ষ করে বলি, হে আমার ইহুদি ভাইয়েরা, আল্লাহকে ভয় করো। মুহাম্মাদ (সা.)-এর আহ্বান মেনে নাও। কারণ, তোমরা নিশ্চিতভাবেই জানো, তাওরাতে শেষ নবির বর্ণনা রয়েছে। আর ইনিই হলেন সেই নবি। নিজের জায়গা থেকে ঘোষণা করছি, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রাসূল। আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান এনেছি।

এবার ইহুদিরা বলল, তুমি আমাদের মিথ্যা বলছ। তুমি একটা শ্রেষ্ঠ মিথ্যাবাদী। এই কথা বলেই গালি দিতে শুরু করে আমাকে। এরপর আমি স্মিত হেসে রাসূল (সা.)-এর দিকে তাকালাম। বললাম, আমি কি আপনাকে বলিনি, জাতগতভাবেই তারা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়? তারা এতটাই প্রবঞ্চক যে, সত্য গোপনে তাদের কখনোই অস্বস্তি হয় না। এরপর আরেকটি ঘোষণা দিয়েছি সবার সামনে। বলেছি, আমার পরিবারও ইসলাম গ্রহণ করেছে;

এমনকি আমার ফুফু খালিদা বিনতে আল হারিসও।[৮]

আরেকজন আলোকিত মানুষের ঘটনাও জানা যায়। মদিনার ইতিহাসের প্রথম দিকের কথা। একজন ইহুদি শিক্ষাবিদ এসেছিলেন ওই শহরে; সিরিয়া থেকে। সময়টা ছিল ইসলাম প্রচারের বেশ কয়েক বছর পূর্বের। তাঁর নাম ইবনে আল হাইবান।

সে বছর অনাবৃষ্টি ও খরার মৌসুম চলছিল। ইহুদিরা ছুটে এলো তাঁর কাছে। অনুরোধ করল বৃষ্টি কামনা করে প্রার্থনার জন্য। কিন্তু বড়ো অঙ্কের দান-সাদাকা দাবি করে বসেন তিনি। একপর্যায়ে তা পূরণ করা হয়। অবশেষে কোনো একটি জায়গায় যেতে বললেন তাদের। তা হবে শহরের বাইরে। সেখানে ইবাদতে শামিল হবে তারা। এই বিজ্ঞ আলিমের সাথে ইহুদিরা চলে গেল। এরপর ইবাদত শেষ না হতেই কালো মেঘে ঢেকে যায় পুরো আকাশ। বৃষ্টি নামে অঝোরধারায়। আরও বেশ কয়েকবার এমন

[৮] সহিহ বুখারি : ৪৪৮০

অলৌকিক বিষয় ঘটেছিল। তাও এই জ্ঞানীর মাধ্যমে।

এই ঘটনাগুলোর বেশ কয়েক দিন পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। মনে হচ্ছিল, মৃত্যু তাঁর অতি নিকটে। তিনি তার সহকর্মীদের সাথে শেষ কথাবার্তা বলছিলেন। নিজেও বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন। তাই ডেকে পাঠালেন লোকজনকে। তাদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার ইহুদি সম্প্রদায়! তোমাদের মনে কি প্রশ্ন জাগে না, কেন আমি সিরিয়ার মতো সম্ভ্রান্ত ও বিলাসী স্থান ছেড়েছি? কেন এই মদিনার মতো ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে ভরা শহরে এসে বসতি গড়েছি? লোকজন বলল, অবশ্যই কোনো যৌক্তিক কারণ আছে। আপনি যে অহেতুক কিছু করবেন, সেটা আমরা বিশ্বাসও করি না।

তখন বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ! একটি কারণ তো আছেই। আর তা হলো, যেকোনো সময় এই শহরে আবির্ভূত হবেন শেষ নবি। এখানেই হিজরত করবেন তিনি। আশা করেছিলাম, তাঁর সাথে মোলাকাত হবে। সুযোগ পাব তাঁকে অনুসরণ করার। কিন্তু সেটা বুঝি আর হচ্ছে না। তবে আমার অনুপস্থিতিতে তাঁকে

পেলে তোমরা তাঁর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। যথাযথ অনুসরণটাও করবে তাঁর। ধর্মের প্রয়োজনে তিনি প্রতিপক্ষের সাথে যুদ্ধও করতে পারেন। আদেশ দিতে পারেন শত্রুর স্ত্রী-সন্তানদের ক্রীতদাস বানানোর জন্য। তখনও সেই মহামানবকে মান্য করবে। আখেরি নবির আনুগত্যে কোনো কিছুই যেন তোমাদের বাধা না দেয়।

কথাগুলো বলার কয়েক দিন পরই মারা যান ইবনে আল হাইবান।

তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরের কথা। হিজরত করে মদিনায় আসেন রাসূল (সা.)। একসময় ইহুদি গোত্র বনু কুরাইজাকে তাদের ক্রমাগত বিশ্বাসঘাতকতার জন্য অবরুদ্ধ করতে হয়। সেই সময়ও গোত্রের বেশ কয়েকজন যুবক ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁরা ইবনে আল হাইবানকে স্মরণ করেছিলেন। তারা তাঁর ভবিষ্যদ্‌বাণীগুলো মনে করেন। তারা উপলব্ধি করলেন, মুহাম্মাদ (সা.)-ই হলেন সেই নবি। অথচ এই সত্যটি বেমালুম অস্বীকার করছিল বয়োজ্যেষ্ঠরা।

যুবকরা তখন বয়োজ্যেষ্ঠদের বিষয়গুলো স্মরণ করিয়ে দিলেন। তারা বললেন, ইবনে আল হাইবান শেষ নবির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির কথা বলেছিলেন। সেসবের প্রতিটিই তো এই মুহাম্মাদের সাথে মিলে যায়। কিন্তু অনেক চেষ্টা-ফিকির করেও কোনোভাবেই প্রবীণদের বোঝানো যায়নি।

অবশেষে গোত্রের বিধিনিষেধ উপেক্ষা করতে বাধ্য হন তাঁরা। নিজেরাই গ্রহণ করে নেন শান্তির ধর্ম ইসলাম। এর মাধ্যমে সম্পদ ও পরিবারকেও হেফাজত করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলো থালাবা ইবনে সায়াহ, উসাইদ ইবনে সায়াহ ও আসাদ ইবনে উবায়েদ।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সিরাতে এ রকম আরও অনেকের তথ্য পাওয়া যায়। ভাবতে পারেন আবিসিনিয়ার বাদশাহ নাজ্জাশির কথাও। সত্য নবির আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন তিনি, বাইবেল ও খ্রিষ্টধর্মের যাজকদের কাছ থেকে। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি ইতিবাচক হয়েছিল। ইসলাম আগমনের প্রথম দিকে সাহাবিদের একটি দল হিজরত করেন তাঁর দেশে। অতঃপর দরবারে সংক্ষিপ্ত ভাষণ দেন

জাফর ইবনে আবু তালিব (রা.)। তা শুনেই ইসলামের যথার্থতা বুঝে ফেলেন বাদশাহ। কারণ, রাসূল (সা.) সম্পর্কে তাঁর পূর্বজ্ঞান ছিল। তাই কুরাইশ নেতাদের প্রবল বিরোধিতাও খারিজ করে দিয়েছেন; এমনকি নিজের দেশে আশ্রয় দিয়েছেন মুহাজিরদের।

এখন আমরা আরেকজন মানুষের কথা বলব। তাঁর নাম সালমান ফারসি (রা.)। তিনি ছিলেন পারস্যের নাগরিক। আরবে সত্যপথের নবি আগমন করবেন, নিজের শিক্ষকের কাছ থেকে এই খবরটি পান। তাই চলে যান মদিনায়। সাক্ষাৎ করেন রাসূল (সা.)-এর সাথে। অতঃপর চিরন্তন আদর্শ ইসলাম কবুল করে নেন। নবিজিও তাঁকে আপন করে নেন। স্বীকৃতি দেন পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে। নানা ঐতিহাসিক ঘটনায় আমরা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখতে পাই; বিশেষ করে খন্দকের যুদ্ধে।

এ কারণেই বলা হয়, জ্ঞান থাকলেই সবাই আলোকিত হয় না। অনেকের সুসংহত জ্ঞানও হেরে যায় অন্ধবিশ্বাসের কাছে। অনেক সময় পদ-পদবির লোভও জয়ী হয় অগাধ জ্ঞানের ওপর।

উদাহরণস্বরূপ আবু আমিরের কথা বলা যায়। মদিনার অন্যতম প্রধান গোত্র আউসের সদস্য ছিল সে। জ্ঞানী হিসেবেই স্বীকৃতি ছিল তার। শেষ নবির আগমন সম্বন্ধেও তার ভালো জ্ঞান ছিল। শুরু থেকেই মহামানবের নানা নিদর্শন ও বৈশিষ্ট্য মানুষকে জানাত সে। প্রচার করত তাঁর আগমনের সময়টিও। কিন্তু রাসূল (সা.) আসার পর এই ব্যক্তির ভূমিকা হয়ে ওঠে সম্পূর্ণ বিপরীত।

নবিজির মদিনায় হিজরতের পর তার সমর্থকদের অনেকেই ইসলাম গ্রহণ করে। এতে কিছুটা প্রভাব হারিয়ে ফেলে সে। কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে তার। ফলে খারিজ করে দেয় ইসলামের সুমহান বার্তা। অথচ শেষ নবির পক্ষে এতদিন সজ্ঞানে অবস্থান নিয়েছিল এই জ্ঞানী ব্যক্তি।

এরপর আবু আমির মক্কায় চলে যায়। তার সাথে ছিল গোত্রীয় ৫০ জন পুরুষ ও যুবক। সবাই যোগ দেয় কুরাইশদের সাথে। মদিনাবাসীদের ওপর আক্রমণ করতেও উদ্যত হয় তারা। তারই আলোকেই অংশ নেয় উহুদের যুদ্ধে। কুরাইশদের সে আশ্বাসও দিয়েছিল, কৌশলে বের করে আনবে

গোত্রীয় সদস্যদের। এভাবেই দুর্বল করবে মুহাম্মাদ (সা.)-এর বাহিনীকে। আওস গোত্র নিয়ে মুশরিকদের কোনো দুশ্চিন্তাই করতে হবে না। তবে তার সে পরিকল্পনা বাস্তবতার মুখ দেখেনি। আল্লাহর রহমত ছিল বলেই এমনটি হয়েছে। জ্ঞানের আলো থাকলেই কেউ আলোকিত হয় না—আবু আমিরই তার দৃষ্টান্ত।

একইভাবে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের কথাও বলা যায়। খাজরাজ গোত্রের নেতা ছিল সে। একপর্যায়ে তার প্রভাব-প্রতিপত্তি নেমে আসে প্রায় শূন্যের কোঠায়। মুহাম্মাদ (সা.)-এর মদিনায় আগমনই এর মূল কারণ। মর্যাদার সবটুকু শেষ হয়ে যাওয়ার চিন্তায় এই ব্যক্তি শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাই অন্তর থেকে ইসলামকে সমর্থন করতে পারেনি।

সত্য অনুধাবনই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের উদ্দেশ্য। অনেকেই বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন। ইন্টারনেট থেকে শুরু করে সর্বত্র বিদ্যার্জনের অবারিত সুযোগ ও মাধ্যম উপস্থিত। এরপরও সত্যিকারের জ্ঞানটা শেখা হয় না। এত কিছুর পরও অন্ধকারে হাতড়ে

মরলে দায়টা কার? আমাদের কাছে ঠিকমতো দাওয়াত আসেনি। বাস্তবতা বুঝতে পারিনি সঠিকভাবে। এভাবে কেউ বলেনি। এই ধরনের যুক্তি কতটা গ্রহণযোগ্য; বিশেষ করে বর্তমান এই তথ্য-প্রযুক্তির যুগে?

চিন্তা করুন আজ থেকে ১৫ শত বছর পূর্বের কথা। ওই সময় কাগজ বা বইপুস্তক আবিষ্কৃত পর্যন্ত হয়নি। অক্ষরজ্ঞানটাও ছিল না আরবের সিংহভাগ লোকের। তখনও কিছু মানুষ প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। তাহলে আমরা কেন নই? সত্যকে মিথ্যা থেকে আলাদা করতে পেরেছিলেন তারা। নিয়োজিত হয়েছেন প্রকৃত ধর্মের সন্ধানে। এর সবই ঘটেছে নবিজি আসার আগে। ফলে আলোকিত হওয়ার সম্মানটুকুও অর্জন করেন। আমাদের সামনে তো সত্য দিবালোকের মতো স্পষ্ট। আসুন, আগের চেয়েও দৃঢ়ভাবে ধারণ করি তাকে। নিজেদের সমৃদ্ধ করি জ্ঞান ও প্রজ্ঞায়। আলোর ঝলকে দূরীভূত হোক জীবনের সব অন্ধকার, আমিন!